জ্যোৎস্নায় নূরলদীনের নিঃসঙ্গতা
ও
অন্যান্য গল্প

সৈয়দ শামসুল হক

সংগ্রহ ও সংকলন
কাজী জাহিদুল হক

ঐতিহ্য

ভূমিকা

সৈয়দ শামসুল হক (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫–১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬) ছয় দশকের অধিককাল ধরে লিখেছেন বিচিত্র বিষয়ের নানান রচনা। তাঁর লেখালেখির পরিমাণ বিপুল।

কবি-সব্যসাচী সৈয়দ হকের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি কবিতা, কথাকাব্য, কাব্যনাটক, গল্প, উপন্যাস, সায়েন্স ফিকশন, শিশুতোষ রচনা, চলচ্চিত্রের কাহিনি, গান, আত্মজৈবনিক রচনা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি। সমসাময়িক ঘটনাবলি নিয়ে কলাম লিখেছেন। তিনি যেমন অনেক বিদেশি কবিতা ও উপন্যাস অনুবাদ করে বাংলা ভাষার পাঠকদের উপহার দিয়েছেন তেমনি তাঁরও অনেক সাহিত্যকর্ম ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি নিজেও তাঁর গ্রন্থ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সব মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই শতাধিক।

কবিতা দিয়ে লেখালেখির সূচনা হলেও প্রথম প্রকাশিত লেখা 'উদয়াস্ত' শীর্ষক একটি গল্প। ফজলে লোহানী (১৯২৮-১৯৮৫) সম্পাদিত 'অগত্যা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে গল্পটি প্রকাশিত হয় 'শামসুল শায়ের' ছদ্মনামে। এরপর থেকে আমৃত্যু তিনি বিরামহীনভাবে লিখে গেছেন এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও গ্রন্থাকারে তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে।

লেখালেখির শুরুতে গল্পলেখক হিসেবেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। প্রথম গল্প প্রকাশের তিন বছর পর ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মোট ৭টি গল্প নিয়ে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *তাস* প্রকাশিত হয়। সৈয়দ হকের বয়স তখন ১৯ বছর। এ বইয়ের শেষ প্রচ্ছদে লেখকের বন্ধু আনিসুজ্জামান [প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০)] লিখেছিলেন–

> পলক পড়ছে তো জন্ম হচ্ছে নতুন স্পন্দন জীবনের ভাঁজে ভাঁজে। নতুন করে, নিজের করে দেখা আর বলার যে ভঙ্গি সৈয়দ শামসুল হক আয়ত্ব করেছেন, মনের গভীরে তা হানা দেয়, সাড়া জাগায়। ভাষার

> উজ্জ্বলতায় তিনি বিশিষ্ট, কলাসৌকর্যের বিশিষ্টতায় তিনি উজ্জ্বল। *তাস* তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ। গভীর আন্তরিকতার সাথে তিনি তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন আজকের নগরসভ্যতার নগ্ন বাস্তবতা, বিশ্লেষণ করেছেন সন্ধানী দৃষ্টিতে। কিন্তু যা সবচেয়ে বড় কথা, তিনি সেই অন্ধকার পর্দা সরিয়ে এমন এক দেশের সন্ধান দিয়েছেন, লক্ষ সূর্যের হীরক-দ্যুতিতে যা আলোকিত, সেখানকার মানুষ আশা-আকাঙ্ক্ষা-মহত্ত্বে ঐশ্বর্যশালী।

তাস সম্পর্কে তখন কলকাতার *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত নাতিদীর্ঘ এক বই-সমালোচনায় লেখা হয়, 'এই বইয়ের অন্তত তিনটি গল্প বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী হয়ে থাকবে।' এর কয়েক বছরের মধ্যেই ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার অর্জন করেন ছোটোগল্পে। বাংলা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর বহুমাত্রিক সৃজনকর্মে।

জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর অন্যান্য গল্পগ্রন্থ *শীতবিকেল* (১৯৫৯), *রক্তগোলাপ* (১৯৬৪), *আনন্দের মৃত্যু* (১৯৬৭), *প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান* (১৯৮১), *জলেশ্বরীর গল্পগুলো প্রথম খণ্ড* (১৯৮৯), *যৌবন ও অন্যান্য জীবন* (২০০৪), *রক্তমাংসের মানুষ* (২০০৬), *ফেরি জাহাজের অপেক্ষায়* (২০১২), *বকুল রঙিন স্টুডিও* (২০১২) এবং *বুকের মধ্যে আশাবৃক্ষ* (২০১৪)। সৈয়দ হকের প্রয়াণোত্তর প্রকাশিত দুটি গল্পগ্রন্থ *জন্মান্ধ রমজান* (২০১৭) ও *কানার হাটবাজার* (২০১৯)। এছাড়া *শ্রেষ্ঠগল্প*, *গল্পসমগ্র*, *প্রেমের গল্প*, *সেরা দশ গল্প*, *গল্পগাথা* ইত্যাদি শিরোনামে তাঁর গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছে। আবার সৈয়দ হক তাঁর অনেক গল্পই স্বতন্ত্র কোনো গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেননি। সৈয়দ হকের জীবদ্দশায় *গল্পসংগ্রহ* শিরোনামে তিন খণ্ডে তাঁর সমুদয় গল্প প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রকাশনা সংস্থা মাওলা ব্রাদার্স। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে আগস্ট সৈয়দ হক *গল্পসংগ্রহ*-এর ভূমিকায় লিখেন, "গল্পে আমি কী 'কাজ' করতে পেরেছি তার নমুনা ধরা থাকবে দুই শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে লেখা আমার গল্পসমুচ্চয়ে।" *গল্পসংগ্রহ* প্রকাশিত হয় সৈয়দ হকের প্রয়াণের পর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ সময়পর্বে। এই সংকলনে মোট ১০৫টি গল্প মুদ্রিত হয়েছে।

আমৃত্যু সৃষ্টিশীল ছিলেন সৈয়দ হক। কর্কটব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায়ও বেশ কয়েকটি ছোটোগল্প, দুইশতাধিক কবিতা এবং কয়েকটি গান রচনা করেছেন। অনুবাদ করেছেন শেক্সপিয়রের *হ্যামলেট* নাটক। সেগুলো তাঁর মৃত্যুর পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশনা সংস্থা দেশখ্যাত *ঐতিহ্য*

থেকে ৩৫ খণ্ডে তাঁর রচনাসমগ্র প্রকাশিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও অনুসন্ধানে সৈয়দ শামসুল হকের অগ্রন্থিত গল্পের সন্ধান মিলছে। যেগুলো নানান সময়ে বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকী কিংবা বিষয়ভিত্তিক সংকলনগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীসময়ে সৈয়দ হকের কোনো স্বতন্ত্র গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তেমনই কয়েকটি গল্পের সংকলন *জ্যোৎস্নায় নূরলদীনের নিঃসঙ্গতা ও অন্যান্য গল্প*। সংকলনভুক্ত কয়েকটি গল্প *গল্পসংগ্রহ*-এর ৩য় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হলেও বাকিগুলো এই প্রথম গ্রন্থভুক্ত হলো।

প্রতিটি গল্পের শেষে উৎস উল্লেখ করা হয়েছে। গল্পগুলোর কোনো কোনোটি এখন থেকে সাত দশক পূর্বে রচিত। গল্পগুলোতে তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতির চিত্র যেমন পাওয়া যাবে তেমনি পাওয়া যাবে বিভিন্ন সময়ে সৈয়দ হকের গল্প বলার নিদর্শন।

মূলত কবি পিয়াস মজিদের অনুপ্রেরণা ও প্রচেষ্টায় এবং সৈয়দ হকের জীবনসঙ্গী খ্যাতনামা লেখক শ্রদ্ধেয় আনোয়ারা সৈয়দ হক ও প্রকাশনা সংস্থা ঐহিত্য-এর প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান নাইমের আগ্রহে গল্পগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

সংকলনভুক্ত গল্পের বাইরে বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে সৈয়দ হকের আরও কিছু গল্প মুদ্রিত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু সংরক্ষণে সীমাহীন অবহেলা আর অপর্যাপ্ততার কারণে সেই সময়ের অনেক পত্র-পত্রিকাই ইতোমধ্যে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাওয়ার এই মুহূর্তে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি (আশা করি পরবর্তী সংস্করণে আরও কয়েকটি গল্প যুক্ত করা সম্ভব হবে)। তারপরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান, এমনকি ব্যক্তি উদ্যোগেও কেউ কেউ পরম মমতায় ও ভালোবাসায় কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা সংরক্ষণ করেছেন বলেই গল্পগুলো পাঠকদের সামনে নতুন করে উপস্থাপন করা সম্ভব হলো। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি গল্পগুলো যেসব পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও সংকলনগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রকাশক ও সম্পাদকগণকে।

গল্পগুলোর অনুসন্ধান ও সংগ্রহে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন বিশিষ্ট গবেষক ড. ইসরাইল খান, গবেষক খালিদ সাইফ, বাংলা একাডেমির ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ গবেষণা কক্ষের জনাব আবদুল মান্নান এবং বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারের পত্রিকা শাখার রেফারেন্স সহকারী মুহাম্মদ রুহুল আমিন ও মোহাম্মদ ইউসুফ মাদবর। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি এবং সংকলন প্রকাশনা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

সংকলনভুক্ত প্রতিটি গল্পই বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে একেকটি অনন্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ভিন্ন পরিবেশ, প্রেক্ষিত, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ ও ভালোবাসার অপ্রতিম একটি সামগ্রিক চিত্র এই গল্পগুলোতে পাওয়া যাবে।

আশা করি সৈয়দ হকের গল্পকার-সত্তার এক বিশেষ রূপ পাঠক এই সংকলনে প্রত্যক্ষ করবেন এবং সৈয়দ হকের ভাষ্য অনুযায়ী গল্পে তিনি কী 'কাজ' করতে পেরেছেন তার আরও কিছু নমুনা থাকবে এই সংকলনে।

কাজী জাহিদুল হক
ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

গল্পসূচি

জ্যোৎস্নায় নূরলদীনের নিঃসঙ্গতা ১১
আপদের বৃষ্টি, করুণার বৃষ্টি ২০
ঝড় ৩১
পুষ্প বিহনে পয়লা বৈশাখ ৩৯
বিয়ের প্রস্তাব ৪৬
উৎপাটিত গর্ভথলি ৫৬
কোথাও আলো নেই ৬৬
রোগ ৮৫
পাপোষ ৯৩
কয়েকটি গল্প ৯৯

জ্যোৎস্নায় নূরলদীনের নিঃসঙ্গতা

মাঝরাতে রংপুরের প্রান্তর পূর্ণিমায় ভেসে যায়, জঙ্গলের ভেতরে ঘুম ভেঙে যায় নূরলদীনের। প্রথম তার মনে হয়, সে শুয়ে আছে তার শৈশবে, আব্বার পাশে, কুঁড়েঘরের মেঝেয় মাটির পরে এবং বাতাসে বড় শীত। যেমন সে শৈশবে আব্বাকে জড়িয়ে ধরতে যায় এবং তখুনি বাস্তব তার কাছে ফিরে আসে, শুয়ে আছে মাটিতেই তারা, পাশে তার স্ত্রী আম্বিয়া, তবে এখন তারা মোগলহাটের গহিন জঙ্গলে।

ঘুমের ভেতরে আম্বিয়া স্বামীর সাগ্রহ বাহুর ভেতরে আরও খানিক সরে আসে, এবং নূরলদীন তৎক্ষণাৎ একটি তেতো ওষুধের মতো স্মরণ করে ওঠে বিকেলে আম্বিয়ার একটি সংলাপ; সে এখন আম্বিয়ার শরীর সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু সহজ হয় না। পূর্ণিমার চাঁদ বাইরে, জঙ্গলের মাথায়, জঙ্গল পেরিয়ে প্রান্তরে ওপারে, নদীর পাড়ে দেবী সিংয়ের কাছারি বাড়ির শান বাঁধানো চত্বরের ওপর খল খল করে হেসে যায়।

ঘুমোতে যাবার কিছু আগে, নূরলদীনের স্মরণ হয় এবং সে চিন্তিত হয়ে পড়ে, বহুদূরে ঘোড়ার খুরের শব্দ সে মুহূর্তের জন্যে পেয়েছিল, তৎক্ষণাৎ মাটিতে সে কান লাগিয়ে শুনবার চেষ্টা করেছিল, অতিক্ষীণ কম্পন ভিন্ন কিছু নয় কিংবা তাও হয়তো নয়, কিছুই সে সিদ্ধান্ত করতে পারেনি। নূরলদীন জানে দেবী সিং কোম্পানির ফৌজ ডেকে এনেছে গ্রাম থেকে গ্রামে, প্রান্তর থেকে প্রান্তরে জঙ্গল থেকে জঙ্গলে সেই ফৌজ তাকে খুঁজে ফিরছে, গ্রামের পর গ্রাম তারা জ্বালিয়ে দিচ্ছে, কিষাণদের ধরে ধরে গাছের ডালে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছে, ত্রাসের ভেতর ঠেসে ধরে কিষাণদের তারা বাধ্য করতে চেষ্টা করছে নূরলদীন আর তার বাহিনীর সন্ধান বলে দেবার জন্যে, নূরলদীন ক্রমশ ডেরা বদল করতে করতে এখন এসে দেবী সিংহেরই কাছারির কাছে জঙ্গলে আস্তানা নিয়েছে, বরং শত্রুর কোলে বেশি নিরাপদ। কিন্তু ঘুমোতে যাবার

আগে ঐ যে তার মনে হয়েছিল ঘোড়ার খুরের শব্দ খুব কাছেই, নূরলদীন হাড়ের ভেতর অস্থিরতা অনুভব করে ওঠে, যেমন তখন, তেমনি এখন এই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে।

সে কি ভীত? ইংরেজ ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনায় সে এখন শীত অনুভব করছে? বিকেলে আম্বিয়ার কথাগুলো, আসলে সংক্ষিপ্ত সামান্য একটি মাত্র বাক্য তার আবার স্মরণ হয়, নূরলদীন নিশ্চিত হতে পারে না, তার এই শীতবোধ কি শত্রুর ঘোড়ার শব্দ পেয়ে, অথবা আম্বিয়ার মুখ থেকে কথাটা শুনে।

ধীরে, সন্তর্পণে, নূরলদীন আম্বিয়ার ঘুমন্ত হাত নিজের দেহ থেকে সরিয়ে দেয়, নিঃশব্দে সে উঠে দাঁড়ায়, তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ফাঁকা জায়গাটির দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে ঘুমিয়ে আছে তার সঙ্গীরা। যদি আব্বাসের সঙ্গে এখন সে কথা বলতে পারে, হয়তো মীমাংসা সম্ভব হবে, কেন তার এই শীতবোধ হাড়ের ভেতরে। অগ্রসর হবার প্রতিটি পদক্ষেপ নূরলদীনের বুকের ভেতর আব্বাসের ক্রোধ ফুঁসে উঠতে থাকে, মাঝে মাঝেই এই অনুভূতি তার হয়, ছেলেবেলার বন্ধুকে তার গলা টিপে হত্যা করতে ইচ্ছে করে একেক সময়। আব্বাস তার সঙ্গেই বেছে নিয়েছে এই কঠিন জীবন, গুপ্ত গণসৈনিকের জীবন, অনুসরণ করছে নূরলদীনকে ছায়ার মতো, কিন্তু কখনোই অস্ত্র হাতে ধরছে না বরং প্রতিটি আলোচনায় আব্বাস বলছে— এই যুদ্ধ করে লাভ নেই, এই যুদ্ধে তুমি কিছুই অর্জন করতে পারবে না।

অথচ, বাল্যবন্ধু বলেই তো আব্বাসের সবচেয়ে ভালো জানবার কথা, এই যুদ্ধ না করে নূরলদীনের আর কোনো কর্তব্য নেই। প্রতিটি খণ্ডযুদ্ধের পর, সঙ্গীরা যখন সকলেই উল্লাসে ফেটে পড়েছে, নূরলদীন লক্ষ করেছে আব্বাসের চোখেই কেবল মাছের মতো দৃষ্টি, আব্বাসের মুখেই কেবল ঈষৎ বিদ্রুপের ঠান্ডা ছুরি।

তবু, এখন এই মাঝরাতে, পূর্ণিমায় যখন প্রান্তর জঙ্গল ভেসে যাচ্ছে, ঘোড়ার খুরের স্মৃতি যখন হানা দিচ্ছে, যেনবা অতি নিকট, নূরলদীন মনে মনে সন্ধান করে আব্বাসকেই।

এবং তাকে সে পায়, সে দেখতে পায় আব্বাসকে, যখন সবাই ঘুমিয়ে, ইতস্তত, আব্বাস একা জেগে এবং আকাশের ঐ অতবড় চাঁদের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে।

নিঃশব্দে নূরলদীন, আব্বাসের পেছনে এসে দাঁড়ায়। মনে মনে হেসে ওঠে নূরলদীন, আব্বাস এখনও গুপ্ত সৈনিকের কিছুই শেখেনি যদিও এতকাল সঙ্গে আছে, তার পেছনে একটি মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে, অথচ আব্বাস তার

কিছুই টের পেল না। এভাবে আত্মহারা হয়ে থাকলে তো কত সহজ তাকে বধ করা, যে কেউ তাকে চোখের পলকে আঘাত করতে পারবে, এবং এত ক্রোধ সত্ত্বেও নূরলদীন এখন আব্বাসের জন্যে প্রবল মমতা অনুভব করে ওঠে, সে শিউরে ওঠে, আব্বাসের দেহে কেউ আঘাত করেছে ভেবেও সে বিচলিত হয়ে পড়ে। নূরলদীন স্নেহের একটি হাত রাখে আব্বাসের পিঠে।

আব্বাস যেন জানতই নূরলদীন আসবে, যেন তার আসবার কথা ছিল এবং তারই অপেক্ষা সে করছিল সবাই যখন ঘুমন্ত তখন একাকী জেগে থেকে। আব্বাস স্মিত চোখে ফিরে তাকায় নূরলদীনের দিকে, কিছুক্ষণের জন্যে, তারপর আবার সে দেখতে থাকে পূর্ণিমার চাঁদ।

এখনও জেগে আছো, আব্বাস? ঘুমোতে যাওনি? সবাই ঘুমিয়ে, তুমি কেন জেগে?

তুমিও তো জেগে। তুমিও তো তোমার পত্নীকে ফেলে এখানে উঠে এসেছ, নূরল। কেন উঠে এলে? যদি তোমার আম্বিয়া কোনো কুস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে ওঠে?

কুস্বপ্ন? আব্বাসের কাঁধে নূরলদীনের হাত কঠিনভাবে বসে যায় ক্ষণকালের জন্যে। তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে নূরলদীন অপ্রতিভ গলায় বলে, কুস্বপ্নের কথা তোমার মনে এল কেন, আব্বাস? স্বপ্ন কি কেবলই কুস্বপ্ন? আর কোনো জাত নেই স্বপ্নের? যেমন সুস্বপ্ন?

নূরলদীন হাড়ের ভেতরে আবার স্মরণ করে ওঠে বিকেলে আম্বিয়ার সেই সংক্ষিপ্ত সামান্য বাক্যটি। নূরলদীন বিস্মিত হয়ে যায়, আব্বাস কী করে এভাবে অনবরত তার মনের খবরগুলো এত সহজে অনুমান করে নেয়। সে জন্যেই বুঝি সহজ হয়, আব্বাসের সঙ্গে তার আলোচনা, স্পষ্ট করে কিছু না বলেও নূরলদীন আশা করতে পারে এত স্বাভাবিকভাবে যে আব্বাস তার সংশয় দূর করতে পারবে।

আব্বাস নূরলদীনের মৃদু তিরস্কার মেশানো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চাঁদের দিকে আঙুল তুলে বলে, ঐ দ্যাখো, কত বড় চাঁদ ভেসে যাচ্ছে নীলের ভেতর দিয়ে, অগণিত তারার বাহিনী তার সঙ্গে। এমন সুন্দর চাঁদ দেখলে কে বলবে পৃথিবীতে এত কষ্ট আছে, এত দুঃখ আছে?

নূরলদীন তেতো গলায় বলে ওঠে, তোমাকে দেখলেই বা কে বলবে তুমি সুখী কোনো গৃহবাসী নও, তুমি গুপ্ত সৈনিকের দলে জঙ্গলে জঙ্গলে পলাতক?

আব্বাস নীরবে হাসে।

গলায় আরও খানিক তেতো এনে নূরলদীন বলে, ঐ চাঁদ তো মাথার ওপর দিয়ে হেঁটে যায়, আব্বাস। তাকায় সে কখনো নিচে?

আব্বাস বিস্মিত হয়ে নূরলদীনের মুখের দিকে তাকায়। পূর্ণিমার আলোয় স্পষ্ট তার মুখ দেখা যায়, নূরলদীনের মুখে এখন ভয়াবহ ক্রোধ সে লক্ষ করে।

নূরলদীন চাপাস্বরে বলে চলে, তিস্তার পানি রক্তে লাল আব্বাস, তোমার ঐ চাঁদ কি তা দ্যাখে? আঙিনায় আমাদের সন্তানেরা অনাহারে কাঁদে, চাঁদ কি তা শোনে? না, আব্বাস, না, পূর্ণিমার চাঁদ আমার চাই না, আমি চাই পূর্ণিমার মতো খল খল করে হেসে উঠুক আমাদের সন্তান, পূর্ণিমার মতো সুখ ভরে থাক আমাদের প্রতিটি আঙিনায়।

হঠাৎ নূরলদীন আব্বাসকে দুহাতে কাছে টেনে বলে, এই তো আমি চাই, এর বেশি তো আমি কিছু চাইনি? এর বিপরীত তো কিছু আমি কখনোই ভাবিনি? আব্বাস, তুই যদি আমার সিনায় কান পেতে শুনিস, তো শুনে দেখবি, এই প্রার্থনা ছাড়া আর কোনো প্রার্থনা নেই আমার। প্রতিটি নিশ্বাসে এই একটি কথাই উচ্চারিত—শোন, শুনে দ্যাখ।

আব্বাসকে আকর্ষণ করে বুকের কাছে প্রায় চেপে ধরেছিল নূরলদীন, সে এখন নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে স্মিত কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে থাকে লোকটির চোখের দিকে। তারপর মৃদু স্বরে উচ্চারণ করে, আমি তো কোনো প্রশ্ন করিনি, সন্দেহ প্রকাশ করিনি, তাহলে এই কৈফিয়ত কেন?

কৈফিয়ত? কী বলছিস, আব্বাস?

কৈফিয়ত নয় তো কী, নূরল? আমি তোমার গলায় শুনতে পাচ্ছি কৈফিয়তের সুর। বলো আমাকে, কী তোমার মনের ভেতর আছে? কোন কাঠঠোকরা তোমার মন এভাবে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে?

নূরলদীন অপ্রস্তুত হয়ে নীরব থাকে, দৃষ্টি একবার চাঁদের প্রতি রাখে, কিন্তু দ্রুত সেখান থেকেও চোখ ফিরিয়ে জঙ্গলের অন্ধকারে রাখে, তারপর ধীরে সে চোখ ফিরিয়ে আনতে থাকে মাটির ওপরে শায়িত ঘুমন্ত তার সঙ্গীদের দিকে।

আব্বাস অনুনয় করে বলে, আমাকে তা বলা যায় না নূরল? সেই কোন কাল থেকে দুজনে আছি যেন দুই ভাই। একই পাত থেকে দুজনে কত কত দিন ভাগ করে খেয়েছি অন্ন। আমাকে তুমি বলতে পারছ না, তোমার মনের ভেতরে কোন কষ্ট এত কষ্ট দিচ্ছে?

অনেকক্ষণ দুই বন্ধু তাকিয়ে থাকে পরস্পরের চোখে চোখ রেখে। নূরল একবার চোখ ফিরিয়ে নিতে যায়, কিন্তু কী সম্মোহনের টানে আবার তার চোখ ফিরে আসে আব্বাসের চোখে।

নূরলদীন অকস্মাৎ চোখ নামিয়ে বলে, আম্বিয়ার পরে আমি খুশি নই।

বিস্মিত হয়ে যায় আব্বাস, ঝুঁকে পড়ে নূরলদীনের চোখ সে ভালো করে দেখতে চায়, কিছুক্ষণ এই স্বচ্ছ প্রবল পূর্ণিমার আলোও তার কাছে আর যথেষ্ট বলে বোধ হয় না। আম্বিয়ার বিষয়ে এমন কথা নূরলদীন আর কবে বলেছে বলে আব্বাসের মনে পড়ে না।

নূরলদীনকে আকর্ষণ করে একটা পতিত গাছের ডালের ওপর বসিয়ে দেয়। আব্বাস নিজেও সে বসে এবং স্বগতোক্তির মতো প্রশ্ন করে চলে, কবে থেকে? কেন? কী হয়েছে? সে তোমার পত্নী, তুমি তার পতিধন, তোমাকে নিয়ে সে এত গৌরব করে, তোমার সঙ্গে হাসিমুখে সে মেনে নিয়েছে জঙ্গলের এই জীবন, আর তুমি তার পরে আর খুশি নও? কী বলছ, নূরল?

নিচু স্বরে নূরল উচ্চারণ করে, সেই বোঝে যে ঘরবাস করে, যার ঘর আছে, সংসার আছে।

হেসে ফেলে আব্বাস।

আমার সংসার নেই, ঘর নেই, পত্নী নেই, এ কথা আর স্মরণ করিয়ে দেবার দরকার কী, নূরল? পত্নী নেই বলেই পত্নীর রীতিও আমি জানি না, জীবনে আমার নারী নেই বলে নারীর মনও আমার খোঁজের বাইরে, সবই সত্যি কথা, তবু এত গর্দভ তো নই যে, বললে বুঝব না? বিশেষ করে, বন্ধুর মনের কষ্ট যদি শুনেও না বুঝতে পারি, তাহলে আর একসঙ্গে এতকাল থেকেই বা কী লাভ। না, তোমাকে বলতেই হবে, নূরল, কেন তুমি আম্বিয়ার ওপর এতখানি অসন্তুষ্ট? কী হয়েছে। তোমার যে এই প্রথম তুমি এত বড় কঠিন একটি কথা উচ্চারণ করলে?

আব্বাসের হাতে নূরলদীন নিজের কাঁধে কয়েকটি ধাক্কা অনুভব করে, প্রবল সে ঝাঁকুনি, যেন এভাবে আব্বাস তার ভেতরের কথা বের করে আনতে চায়, যেন বা কলসি থেকে গাঢ় গুড়।

অনেকক্ষণ ইতস্তত করবার পর নূরলদীন বলে, আম্বিয়া আমার পরিবার, আমার সেই পরিবারই যদি আমাকে না বোঝে তাহলে আর কার কাছে আশা আছে? দুনিয়ার সকল জোড়ার সবচেয়ে বড় জোড়া মানুষের জোড়া, পতি পত্নীর জোড়া, যেন একই ছবির আয়নায় দুটি প্রতিফলন, নয়? অবিকল, রূপ ও প্রতিরূপ, এতই তার শোভা যে সেই শোভা ভাঙতে মালেকুল মউতেরও বুক ভেঙে যায়, মউতের ফেরেশতারও চোখে পানি এসে যায়, নূরল।

বিস্মিত গলায় আব্বাস প্রশ্ন করে, ভাঙবার কথা বারবার কেন বলছ? ভাঙবার কথা কেন আসছে?

আসে, আব্বাস, আসে। মাঝির অন্তর যদি ভেঙে যায়, তাহলে তার সাধের নৌকোর খোলও টুকরো টুকরো হয়ে নদীর পানিতে ভেসে যায়, জান না?

ধমক দেয় আব্বাস।

স্পষ্ট করে বল। আশপাশে কোনো কথা আমি বুঝতে পারি না। বলো।

দুম করে নূরলদীন তখন বলে বসে, আম্বিয়া স্বপ্ন দ্যাখে, আব্বাস, যে আমি বসে আছি সিংহাসনে, আর সে আমার বাম পাশে।

হাঃ করে হেসে ফেলে আব্বাস। মাথা দোলায় সে, যেন কত কৌতুক। আব্বাস তো এই কথাটিই কতবার আকারে ইঙ্গিতে নূরলদীনকে বলতে চেয়েছিল, এই সন্দেহই সে করেছিল গোড়া থেকে, আজ তা নূরলদীনের কণ্ঠেই স্পষ্ট উচ্চারিত হতে শুনে সে বড় মজা অনুভব করে।

হাসছ?

না, হাসছি না। আব্বাস তবু হাসতে হাসতেই বলে, আম্বিয়া তোমাকে বড় ভালোবাসে, তাই সে এই স্বপ্ন দ্যাখে।

ভালোবাসে? চিৎকার করে ওঠে নূরলদীন। পরমুহূর্তে তার খেয়াল হয়, সঙ্গীরা আশপাশেই ঘুমিয়ে আছে, সে সামলে নেয় নিজেকে। ফিসফিস করে আরেকবার এখন প্রতিধ্বনি করে, ভালোবাসে?

হ্যাঁ, ভালো তো বাসেই। নইলে এ স্বপ্ন দেখবে কেন? তুমি সিংহাসনে।

আব্বাস, নবাবের সিংহাসনে বসবার কোনো লোভ, কোনো স্বপ্ন যে আমার নেই, তা আর কেউ না জানুক, তুমি তো জান। জান না? তবু তুমি হাসছ, আর আমাকে বলছ, আম্বিয়া আমাকে ভালোবাসে? তুমি বলতে চাইছ, ভালোবেসে পত্নী যে স্বপ্ন দ্যাখে পতির তাতে বিরূপ না হওয়াই কর্তব্য, এই তো?

আব্বাস পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার নিজের সংসার নেই, পত্নী নেই, নিজেই সে ধন্যবাদ দেয় এতকাল একাকী থাকবার জন্যে। ঈষৎ শিউরে ওঠে, তার বাল্যবন্ধুর এই সংকট স্মরণ করে। দুই বিপরীত অনুভূতির ভেতরে সে চাঁদের প্রবল আলোকে শব্দময় বলে বোধ করতে থাকে।

অশান্ত পায়চারি করতে করতে নূরলদীন বলে, কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক তাতে আমার কিছু এসে যায় না, আব্বাস। তোমার বিশ্বাসের ভেতরে আমার যেন স্থান হয়, এবং চিরকাল থাকে। তোর কি মনে পড়ে না, আব্বাস, সেই পাটগ্রামের কথা? মনে পড়ে? কিষাণেরা আমাকে সেদিন, এমনি এক পূর্ণিমার রাতে, প্রান্তরে মাথায় তুলে ধরল, আমাকে তাদের নেতা করল? মনে পড়ে রে? আমাকে তারা মাথায় তুলে গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল। তুই সঙ্গে

এলি না। ঘরে ফিরে আমি দেওয়ানকে পাঠালাম তোর কাছে। তুই এলি মাঝরাতে। আমরা দুজনে বসলাম আঙিনায়, আর সেদিনও ছিল এমনি পূর্ণিমা। মনে পড়ে?

পড়বে না কেন? আমি আসতেই আমার হাত ধরে তুই জানতে চাইলি, আমি কেন গণের মিছিলে তোর সঙ্গে এলাম না গাঁয়ে। হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ে।

নূরল তেতো গলায় বলে, আর আমারও মনে পড়ে কী উত্তর তুই দিয়েছিলি আমার কথার।

মনে আছে?

মনে আছে। তুই বলেছিলি, আমার কেমন আক্কেল যে মানুষের মাথায় আমি চড়ে বসলাম। তাই না? তুই না? তুই বলেছিলি, আমি ভুলিনি, আব্বাস, তুই বলেছিলি, মানুষ যে আমাকে মাথায় করে নাচে; আমাকে যে নাচায়, তারা নূরলদীনের নাচায় না, এক পুতুলকে নাচায়।

তাহলে তো মনেই আছে। সব কথা মনে আছে নূরল?

মনে আছে। তুই বলেছিলি, কোম্পানির গোলা আছে, কামান আছে, শিক্ষিত সেপাহি আছে, আমার নাচন ছাড়া আর কী আছে? লাঠি? তাও তো অনেকেরই নেই। বলেছিলি, পরাজয় আমার হবে। বলেছিলি, আমাকে যারা মাথায় করে নাচে, পরাজয়কালে আমাকেই তারা দোষ দেবে, ফেলে চলে যাবে, আমার লাশের দিকে তারা ফিরেও তাকাবে না। তাই না?

হ্যাঁ। বলেছিলাম। এখনও বলছি।

এখনও? এত যুদ্ধে জয়ের পরও?

হ্যাঁ, এত যুদ্ধের তোমার জয়ের পরেও আমি বলছি, নূরল। মানুষ তোমার লাশের দিকে ফিরেও তাকাবে না।

কেন, আব্বাস? কেন?

সে রাতে কি আমি বলিনি, নূরল? বলিনি, যে মানুষ আসলে চায়—তুমি জয় করে দেবে, তুমি তাদের হাতের মুঠো ভরে দেবে, কিন্তু তার জন্যে যে ধৈর্য যে প্রস্তুতি দরকার তা তারা রাখবে না, নেবে না? মানুষ বিজয় চায়, তারা লাশ চায় না, নূরল। মানুষ নগদ চায়, ধৈর্য ধরতে চায় না, নিজের জীবন ছেড়ে দূরের দিকে তারা তাকায় না, বড় লম্বা আন্দোলনে ভীত হয় মানুষ। তাই তো আমি বারবার বলি, তোমার এই আন্দোলনে তুমি সফল হবে না। তাই আমি বহুবার তোমাকে বলেছি, নূরল, লোকের কথায় না নেচে উঠে পাহাড়ি নদীর মতো সমতলে ঝাঁপ দিও না। আগে মানুষ তৈরি করো, ধীরে ধীরে পায়ের নিচে মাটিকে তৈরি করো, দেশের সন্তানকে গড়ে তোলো, এমন মাটিতে সবাইকে গড়ে তোলো যেন তারা জমিদার কি মহাজন কি নবাব না

হয় নিজেরাই। যেন তারা সকলের সঙ্গে অন্নপান ভাগ করে খায়। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করো, ইংরেজ তো কালাপানির পাড়ের মানুষ, বিদেশের তারা, নবাব কি মহাজন তো বিদেশি নয়, তোমার আমার মতো তাদের জন্মও তা এই দেশেরই মাটিতে হয়েছে, হচ্ছে, হবে। বলো, কী নিশ্চয়তা আছে, যদি না মানুষকে সেভাবে তুমি তৈরি করো, আবার এই মাটিতেই নবাব বা মহাজন বা জমিদার জন্ম নেবে না? তাই তো বারবার আমি একটি কথাই তোমাকে বলি, নূরল, মানুষ তৈরি করো, মাটি শক্ত করো, তবে আগেই এভাবে তুমি ঝাঁপ দিয়ো না।

নিস্তেজ গলায় নূরলদীন একবার ডাক দেয়, আব্বাস।

আব্বাস অপেক্ষা করে।

অনেকক্ষণ নূরলদীন কিছু বলে না, গাছের ডালের ওপর স্থির মূর্তির মতো বসে থাকে।

তারপর হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

কিন্তু আমার যে সহ্য হয় না, আব্বাস। আমার যে এই অনাহার, এই অত্যাচার দেখে আর রক্ত স্থির থাকে না। আমি যে আমার হাতের মুঠোয় অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। আমি তো মানুষ। মানুষ হয়ে কী করে আমি চোখের ওপরে দেখব ইংরেজ আর দেবী সিং আর মহাজনদের এই অত্যাচার?

আব্বাস তখন মৃদু গলায় স্মরণ করিয়ে দেয়, মানুষ তৈরি না করলে তোমাকেই একদিন নবাব বলে তারা তাজ পরিয়ে দেবে।

না।

এবং না তুমিও হবে আরও এক নবাব।

অন্য পরে কী কথা, নূরল? তোমার সবচেয়ে কাছের মানুষ যে আম্বিয়া, সেও তো তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দ্যাখে, তুমি নবাব।

না। চিৎকার করে ওঠে নূরলদীন। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে সে, অপ্রতিভ চোখে ইতস্তত তাকায়, তার মনে পড়ে যায় বিকেলে আম্বিয়ার সেই সংক্ষিপ্ত বাক্য, আমার বড় সাধ তোমাকে নবাবের তাজ মাথায় দেখি।

নূরলদীন বিড়বিড় করে বলে চলে, আছে আল্লা মাথার ওপরে, তিনিই জানেন, আম্বিয়া না জানুক, আব্বাস না জানুক কেউ না জানুক, আল্লা তো জানেন আমার অন্তরে যে আগুন জ্বলছে সেই আগুনে দুনিয়ার সমস্ত সিংহাসন পুড়ে যায়। সে আগুন সেই দূর ছিয়াত্তরের, সূর্যের সেই আগুনে ঝলসে গিয়েছে মাঠ, পুড়ে গিয়েছে শস্য, দেবী সিংহের খাজনা দেবার জন্যে আমার আব্বা হালের বলদ বেচে দিয়েছেন, নিজে তিনি বলদের মতো হাল টেনে

পোড়া মাটিতে শস্য ফলাবার চেষ্টা করেছেন। আমি তাকে দেখেছি, কাঁধে জোয়াল নিয়ে লাঙল টানতে টানতে কোমর ভেঙে পড়ে যেতে, দুপুরের ঝলসানো রোদের ভেতরে তার গলা দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরিয়েছে, আমি দেখেছি তার সেই রক্তে মাঠ ভিজে যেতে, আমি শুনেছি সেই রোদের ভেতরে মাটিতে মুখে থুবড়ে পড়ে অন্তিমকালে বলদের মতো তাকে আর্ত হাম্বারব করে উঠতে। এই পূর্ণিমায় যতই কোমলতা থাক, আব্বাস সেই রোদের আগুন আর হলকা তো আমি ভুলতে পারি না। সে আগুন আমার বুকের ভেতর থেকে নেভে না, যেন তা না নেভে যতদিন পর্যন্ত না দুনিয়ার সব রাজ সিংহাসন পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

রংপুরের আকাশে বাংলা এগারোশ ঊননব্বই সনের এক পূর্ণিমার চাঁদ হঠাৎ বীভৎস বলে বোধ হয়। আব্বাস ও নূরলদীন দুজনেই এই সেই দগ্ধ চাঁদের নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে।